ওপারে

রেহনুমা বিন্‌ত আনিস

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

ওহে! তোমার মশক থেকে প্রতি মুহূর্তে চুইয়ে পড়ছে জীবনের নির্যাস। এর একেকটি ফোঁটায় তুমি প্রস্ফুটিত করতে পারতে মরুভূমিতে পুষ্পোদ্যান; পাহাড়ের বুক চিরে ছোটাতে পারতে বেগবান নদী, ওই নীলাকাশটা ভাসিয়ে দিতে পারতে সাতরঙা আলোয়! তবে এই পড়ন্ত বিকেলের হলুদাভ আলোয় চোখ মুদে কীসের ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছ তুমি? তোমার মশকের পানি যে ফুরিয়ে এল! দিন না হয় গেলই, অন্তত গোধূলীর লগ্নটি কি তুমি রাঙিয়ে দিতে চাও না তোমার নিজের রঙে?

তারপরও মশকের পানি ফুরিয়ে যাবে, গোধূলির রং হারিয়ে যাবে, অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে এই পৃথিবীটাও। কিন্তু স্রষ্টার সামনে দাঁড়িয়ে তুমি বলতে পারবে, 'তোমার সৃষ্টি আমি অর্থহীন প্রতিপন্ন করে আসিনি, একটি দিনের জন্য আমি জ্বলে উঠেছিলাম আপন আলোয়।'

সেটুকুই হোক না অর্জন!

এপারের পাতায়

আমি আত্মহত্যা করব!

'জামিল, তুমি যদি আমাকে বিয়ে না করো, তাহলে আমি আত্মহত্যা করব।'

খাতা চেক করতে গিয়ে এই একান্ত বার্তাটি চোখে পড়ে যাওয়ায় অত্যন্ত বিব্রতবোধ করলাম। স্পষ্টতই বার্তাটি আমার জন্য লেখা নয়, আমার দৃষ্টির জন্যও নয়, খাতার মধ্যে এল কীভাবে তাও বোধগম্য নয়। কিন্তু প্রাথমিকভাবে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবার পর যখন বার্তার বিষয়বস্তু আমার মাথায় উদিত হলো, তখন বুঝতে পারলাম এমন একটি বিষয় জানার পরে চুপচাপ খাতা চেক করে ছাত্রীকে ফিরিয়ে দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শিক্ষক হিসেবে না হোক, মানুষ হিসেবে আমাকে কিছু করতেই হবে।

খাতা দেখা শেষে ছাত্রীকে ডেকে পাঠালাম। সময় নির্বাচন করতে হচ্ছিল এমনভাবে যেন সে-সময় আর কেউ রুমে উপস্থিত না থাকে, যেহেতু এটি তার একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। আমার ছাত্রী হলেও বয়সে সে আমার চেয়ে খুব বেশি ছোট নয়, কিন্তু আমার সকল ছাত্রছাত্রীর প্রতি আমার আচরণ মাতৃসুলভ। তাই তাদের আদর করতে যেমন কুণ্ঠিত হই না, তেমনি বকা দিতেও পিছপা হই না। সে রুমে প্রবেশ করার সাথে সাথেই ওকে নিয়ে ছুটলাম, 'তোমরা জীবনটাকে কী মনে করো বলো তো। জীবনটা কি এত সস্তা যে ইচ্ছে হলো আর ছুড়ে ফেলে দিলে? তোমার বাবা-মা কত স্বপ্ন নিয়ে তোমাকে এত বছর ধরে পেলেপুষে মানুষ করেছেন, কত আশা নিয়ে এমন ব্যয়বহুল একটি প্রতিষ্ঠানে পড়তে পাঠিয়েছেন। তাদের কথা ভাবলে না? তোমার ভাইবোনের কী হবে তাও না? একটা ছেলেই কি তবে তোমার জীবনের সব হয়ে গেল? পৃথিবীটা কত বড়! অথচ তুমি এমন একজনের জন্য জীবনটাকে তুচ্ছ মনে করছ, যে তোমাকে চায়-ই না! এই চিঠি যদি আমার হাতে না পড়ে তোমার বাবা-মার হাতে পড়ত তাহলে তাদের কী অবস্থা হতো ভেবে দেখেছ?'

আমার কথার তোড়ে ঝড়ে পড়া পাখির মতো কোনোক্রমে ভেসে থাকার চেষ্টায় ছিল সে। এবার বলল, 'ম্যাডাম, স্যরি, আসলে আমার জানা ছিল না, চিঠিটা খাতার ভেতর ছিল। আসলে ওটা কিছু না।'

এবার মেজাজটা সত্যিই খারাপ হলো। আমি বলি কী, আর আমাকে বলে কী? বললাম, 'ওটা কিছু না মানে? তুমি আত্মহত্যার পরিকল্পনা করছ, ওটা কিছু না?'

সে আমাকে জানাল, 'আসলে ম্যাডাম, সে আমার শিক্ষক ছিল। আমি যখন জানতে পারি, বিয়ের কয়েক মাসের মাথায় ওর স্ত্রী মারা যায়, তাই সে সারাক্ষণ বিষণ্ণ থাকে, আমার

মাঝে প্রচণ্ড সহানুভূতির সৃষ্টি হয়। সহানুভূতি থেকে যে কীভাবে আমি ওকে ভালোবেসে ফেললাম তা নিজেও বুঝিনি। ওকে যখন বললাম আমি ওকে বিয়ে করতে চাই, চাই ওর জীবনের বিষণ্ণতাগুলো সুখের রঙের আড়ালে ঢেকে দিতে, তখন সে শুধু বলল, 'আমার সাহস হয় না। একবার স্বপ্নভঙ্গের পর আবার ঘর সাজাতে ভয় হয়।।' আমি তখন দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম ম্যাডাম। আমি ওকে চাপ দেয়ার জন্য এই চিঠিটা লিখেছিলাম।'

আমি বললাম, 'তুমি যদি একান্তই তাকে বিয়ে করতে চাও তাহলে তোমার বাবা-মায়ের সাথে কথা বলো, তাদের মাধ্যমে যা করার করো। আর এই সমস্ত বাজে চিন্তা থেকে দূরে থাকো। ঠিক আছে?'

সে বলল, 'আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি ম্যাডাম, আমি আর ওই ধরনের চিন্তা করব না।'

ধরে নিই ওর নাম স্বাতী। আমি সেই ইউনিভার্সিটিতে যোগ দিই ইংরেজি ডিপার্টমেন্টের উদ্বোধনী শিক্ষকদের একজন হিসেবে। তখন ইংরেজি ডিপার্টমেন্টের অনার্সের একটাই ব্যাচ। এই উদ্বোধনী ব্যাচটি ছিল আমাদের সবচেয়ে উজ্জ্বল এবং মেধাবী ব্যাচগুলোর একটি। এদের বাবা-মা এদের যেকোনো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করাতে পারতেন কিন্তু শুধু মেয়েদের আলাদা ক্যাম্পাস হবার কারণে এই ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পাঠান।

স্বাতী যেমন লেখাপড়ায় ভালো ছিল, তেমনি বিতর্ক, বক্তৃতা, আবৃত্তি, স্মার্টনেস, কনফিডেন্স কোনো দিকেই পারদর্শিতা তার অভাব ছিল না। দেখতেও ছিল চমৎকার। এই ঘটনার তিন মাস পর একদিন ইউনিভার্সিটির মূল ক্যাম্পাসের গেটে ওর সাথে দেখা। সে বলল, 'ম্যাডাম, প্লিজ একটু এদিকে আসুন।' ওর সাথে গিয়ে দেখলাম একপাশে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন, মাঝারি গোছের, শ্যামলা। সে বলল, 'ম্যাডাম ইনিই জামিল, যার কথা আপনাকে বলেছিলাম। কিছুদিন হলো আমাদের বিয়ে হয়েছে।' তাদের অভিনন্দন জানালাম, জামিলের মুখের হাসিটাই জানান দিচ্ছিল স্বাতীর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। ভাবছিলাম, সবাই যদি এমন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বিয়ে করত কত ভালোই না হতো!

এর দু-তিন মাস পর দেখা গেল স্বাতী ইউনিভার্সিটি আসছে না। ওর বান্ধবীরা কেউ কিছু জানে না। ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়ার ব্যাপারে গাফলতি করলে আমার প্রচণ্ড মেজাজ খারাপ হয়। লেখাপড়াই তো ছাত্রজীবনের পেশা। তাহলে কী এমন জরুরি কাজ থাকতে পারে যার জন্য ওরা লেখাপড়া করতে পারবে না? আর বিয়ের পর মেয়েরা লেখাপড়ায় ঢিল দিলে একেবারে অসহ্য লাগে। আরে বাবা! তোমার স্বামী কি বিয়ে করে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে? তাহলে তুমি কেন লেখাপড়া বিসর্জন দিয়ে বসে থাকবে? তাহলে তো একসময় তার মনে হবে, 'দেখেশুনে তবে কি মূর্খ বিয়ে করলাম?'এক সপ্তাহ হয়ে গেল ওর কোনো খোঁজ নেই।

লাইসেন্স টু কিল

১

ছেলেটির শীর্ণ হাতখানা আমার হাতখানি আঁকড়ে ধরে আছে পরম নির্ভরতায়, মোটা চশমাটার আড়ালে বড় বড় চোখদুটোতে গভীর বিশ্বাস। কিন্তু ওর এই উদার হৃদয়খানির উৎস যেখানটাতে, সে ছোট্ট বুকটার ভেতর হৃৎপিণ্ডটাতে একটা ফুটো, যা তাকে এতোটা অসুস্থ করে রেখেছে যে স্বাভাবিক কাজগুলো করাও ওর জন্য এক একটা পরীক্ষা। ও যখন ওর মায়ের ভেতরে একটু একটু করে বড় হচ্ছে, তখন ডাক্তার তাঁকে অ্যান্টিবায়োটিক দেন সামান্য সর্দিজ্বর ভালো হয়ে যাবার জন্য।

সর্দিজ্বর ভালো হয়ে গেল, কিন্তু বাচ্চাটার হৃৎপিণ্ডে একটা ফুটো রেখে দিয়ে গেল সেই অ্যান্টিবায়োটিক। সেটা সারাবার জন্য বাবা-মা ওকে নিয়ে কোথায় ছুটোছুটি করেননি! মাদ্রাজ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু ওর হার্টের গঠনেই সমস্যা। এভাবেই বাঁচতে হবে তাকে, যে কবছর বাঁচে। ডাক্তারের একটি ভুল সিদ্ধান্তের কারণে একটি সম্পূর্ণ সুস্থ শিশু পৃথিবীতে আসার আগেই অসুস্থ হয়ে পড়ল।

২

মেয়েটির মা বাড়ি বাড়ি গিয়ে শাড়ি বিক্রি করত। ছোটখাটো মহিলাটি রুচিশীলা। গরিব হলেও ফিটফাটভাবে চলে। মেয়েটিও সাথে আসত মাঝেমধ্যে। আট বছর বয়সি চঞ্চলা মেয়েটি একদিন রাস্তা পার হতে গিয়ে গাড়িচাপা পড়ল। ডাক্তার বলল ওর আহত পা-টি কেটে ফেলতে হবে। মেয়েটির বাবা-মা নানাভাবে ডাক্তারকে বোঝানোর চেষ্টা করল—আট বছর বয়সের একটি মেয়ে এক পায়ে কীভাবে বাকি জীবনটা পার করবে? গরিবের মেয়ে, কে বিয়ে করবে ওকে? বিয়ে না হলে সে নিজেই-বা কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করবে? কোনো কথা শুনলো না ডাক্তার, পা-খানি কেটে ফেলে দিলো।

যেদিন মেয়েটাকে হাসপাতাল থেকে রিলিজ দেবে সেদিন ডাক্তার ওর বাবা-মাকে জানালো, ‘২০ হাজার টাকা হলে আমরা ওর পা’টা বাঁচাতে পারতাম।’ কপাল চাপড়ে কাঁদতে লাগল ওর মা, ‘মাত্র ২০ হাজার টাকার জন্য ওরা আমার মেয়েটার পা কেটে তাকে চিরতরে পঙ্গু করে দিলো। আমার স্বামী বাবুর্চি, প্রতিবার রান্না করলে তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা পায়। কতদিন লাগত আমাদের বিশ হাজার টাকা জোগাড় করতে? দরকার হলে আমরা ভিক্ষা করে এই টাকা জোগাড় করতাম। ২০ হাজার টাকার জন্য ডাক্তার আমার মেয়েটাকে পঙ্গু করে দিলো। এখন আমি ডাক্তারকে কত টাকা দিলে সে ওর পা ফিরিয়ে দিতে পারবে?’

কোফতা বানানো

কোফতা বানাচ্ছিলাম। এক কড়াই চুলায় বসিয়ে, আরেক কড়াই তৈরি করছিলাম। শেষের দিকে এসে যা হয় আর কি, শেষ কোফতাটার স্বাস্থ্য ভালো হলো না। পিচ্চি কোফতাটাকে অন্য স্বাস্থ্যবান কোফতাগুলোর পাশে বড় বেমানান দেখাচ্ছিল। কী করা যায়? চোখের রাডার ঘুরিয়ে দেখে নিলাম কোনগুলো অতিরিক্ত মেদযুক্ত। তারপর তাদের প্রত্যেকটা থেকে কিছু কিছু নিয়ে পিচ্চি কোফতাটায় জোড়া দিতে লাগলাম। একসময় দেখা গেল সবগুলো সমান সাইজ হয়ে গিয়েছে। পিচ্চি কোফতাটাকে এখন মোটেই দৃষ্টিকটুভাবে শীর্ণ দেখাচ্ছে না, আবার বড়গুলোকেও অতিরিক্ত বড় দেখাচ্ছে না। একটা সুন্দর সুদৃশ্য সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দৃশ্যটা দেখে নিজের কারিশমায় নিজেই অভিভূত হয়ে গেলাম, খুশিতে নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ে দিই পারলে!

এমন সময় মাথায় এল—হায়রে বোকা মানুষ, আমাদের প্রভু তো আমাদের এই সহজ কাজটিই করতে বলেছেন! ধনীদের দান-সাদাকা, যাকাত দিতে বলেছেন কেবল এই ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য, যেন কেউ অভাবগ্রস্ত না থাকে, আবার কেউ টাকার পাহাড় নিয়ে বসে ধনসম্পদকেই জীবনের ধ্যানজ্ঞান-সাধনা ভেবে না বসে। এতে কারও-ই ক্ষতি নেই, সবারই লাভ। অথচ এই সহজ কাজটিই কেউ করতে চায় না। কেন বলছি?

গতকালই পড়ছিলাম পৃথিবীর অর্ধেক মানুষের সমান সম্পদ পুঞ্জীভূত রয়েছে মাত্র ৮৫ জন ধনকুবেরের হাতে। একটা মানুষের একজীবনে কত লাগে? সামনে যতই মজার মজার খাবার এনে সাজিয়ে দেয়া হোক-না-কেন, একজন দরিদ্র যতটুকু খেতে পারবে একজন ধনীর পেটেও তো ঠিক ততটুকুরই জায়গা হয়, কেউ তো পেটের বাইরে খেতে পারে না! একইভাবে জীবনের অন্য প্রয়োজনগুলোও যতটা না প্রকৃত প্রয়োজন, তার চেয়েও বেশি কাল্পনিক। প্রকৃত এবং কাল্পনিক প্রয়োজনগুলোর মাঝে পার্থক্য করতে পারা সুখী হবার অন্যতম চাবিকাঠি।

আবার মানুষের সব প্রয়োজন পূরণ হয়ে গেলেও মানুষের জীবনের প্রতি কোনো আকর্ষণ থাকে না। একটা রেসকিউ সিরিজ দেখতাম, তেমন বিখ্যাত কোনো অনুষ্ঠান নয়, কিন্তু আমার ভালো লাগত। কিছু নিবেদিতপ্রাণ রেসকিউ কর্মী অসম্ভব সব পরিস্থিতিতে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও বিপদগ্রস্ত মানুষদের রক্ষা করার চেষ্টা করত। তারই একটি দেখে বুঝলাম কেন আপাতদৃষ্টিতে সুখী মানুষরাও আত্মহত্যা করে।

এক লোক বারবার আত্মহত্যা করার চেষ্টা চালায়, তার প্রচেষ্টা ব্যাহত করতে গিয়ে রেসকিউ টিমের কর্মীরা আরও গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সময় দিতে পারে না। শেষমেশ তার কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে রেসকিউ টিমের একজন সদস্যকে সার্বক্ষণিকভাবে তার সাথে থাকার দায়িত্ব দিয়ে দেয়া হলো। সেই কর্মীও বিরক্ত। তার বন্ধুরা মানুষকে জ্বলন্ত আগুন থেকে রক্ষা করছে, সাগরের উত্তাল ঢেউ থেকে তুলে আনছে, তীব্র ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের মাঝে মানুষকে সাহায্য করতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে—আর সে কিনা এক ধনীর সাথে ঘুরে ঘুরে সময় কাটাচ্ছে যাকে শিশুদের মতো দেখে রাখতে হয়, যে সুযোগ পেলেই আত্মহত্যার পাঁয়তারা করে। একদিন সে চরম বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেসই করে ফেলল, 'কী ব্যাপার? কী নেই তোমার? বাড়ি, গাড়ি, পরিবার, পরিজন, বন্ধুবান্ধব, অর্থসম্পদ ... কী নেই? কেন তুমি আত্মহত্যা করতে চাও?'

ধনী লোকটি বলল, 'সেটাই তো সমস্যা!'

রেসকিউ কর্মী হতবাক হয়ে গেল, 'মানে?'

'যাদের এসব নেই, বা এর কিছু কিছু নেই, তাদের জীবনের একটা লক্ষ্য থাকে, একটা উদ্দেশ্য থাকে। সেটাই তাদের প্রতিদিন ভোর থেকে রাত পর্যন্ত তাড়না দেয়, প্রেরণা দেয়। আমি কী করি বলো তো। প্রতিদিন ভোরে বিছানায় চোখ খুলেই ভাবি, 'আজ আমি কী করব?' কিন্তু করার মতো কিছুই খুঁজে পাই না। কারণ, পুরো পৃথিবী আমার হাতের মুঠোয়। এমন কিছু নেই যা আমি চাইলে পেতে পারি না, এমন কিছু নেই যা আমার আস্বাদন করা হয়নি, এমন কিছু নেই যা আমার করার সাধ অবশিষ্ট রয়েছে। তখন মনে হয় আবার চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ি। কারণ, আমার জীবনের আর কোনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নেই।'

রেসকিউ কর্মীটি যেন কথাগুলো বুঝেও বুঝে উঠতে পারল না। সে রেলিং দেয়া সাগরপারকে নিরাপদ মনে করে এক বোতল পানি কিনতে ফেরিওয়ালার কাছে গেল। পেছন ফিরতেই দেখে লোকটি রেলিং টপকে শক্ত এবং ধারালো পাথুরে সৈকতের ওপর আছড়ে পড়ে আত্মহত্যা করে ফেলেছে।

তাহলে এত সম্পদ দিয়ে কী হবে, যা অর্জন করতে গিয়ে আমরা জীবনে যা-কিছু গুরুত্বপূর্ণ তার প্রতি সময় দিতে পারি না? স্ত্রীর ভালোবাসা কি অর্থ দিয়ে পাওয়া যায়? এক সমীক্ষায় প্রকাশিত হয়েছে, ৮৫% নারী চান দরিদ্র হলেও সময় দিতে সক্ষম স্বামী। আবার অতিরিক্ত সম্পদশালীরা ব্যক্তিসুখের চেয়ে সম্পদকে প্রাধান্য দিতে শুরু করে। সুতরাং উভয় দিক থেকে এই ধনলিপ্সার শেষফল হতাশা এবং অপূর্ণতা। বরং যা কিছু আমাদের সবার মিলে আছে তা সবার মাঝে ভাগাভাগি করে নিলে, সবাই সবার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে,

সবার যৌক্তিক প্রয়োজনই পূরণ হওয়া সম্ভব। আর অযৌক্তিক প্রয়োজন? সে জাহান্নামের আগুনে পুড়ে কোফতা হওয়ার আগে কোনো কিছু দিয়ে মিটবে না!

চাকরি

আপনি একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর পদে কর্মরত। আপনার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সাফল্যের সাথে পালন করার দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে আপনাকে প্রতি বছর কোম্পানীর পক্ষ থেকে ট্রেনিং দেয়া হয়। এই বছর আপনি সিদ্ধান্ত নিলেন, এই ট্রেনিং আমি বহুবছর যাবৎ করে আসছি, এটাকে এত গুরুত্ব দেয়ার কিছু নেই। ট্রেনিং চলাকালীন আপনি কিছু ক্লাস করলেন, কিছু ক্লাস করলেন না, কিছু সময় ট্রেনিং সেন্টারের পাশের মলে শপিং করলেন, কিছুসময় বাসায় মুভি দেখে কাটালেন, আর রাতের বেলা পড়াশোনার পরিবর্তে বন্ধুদের সাথে পার্টি করলেন। ট্রেনিং শেষ হলো, সবাই কাজে ফিরে গেল। আপনার সহকর্মীরা সমস্ত কিছু ঝালাই করে নতুন উদ্যমে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তাদের কর্মদক্ষতা আরও বহুগুণ বেড়ে গেল। আর আপনি? থিওরিটা আবছা আবছা মনে করতে পারছেন, কিন্তু কাজের প্রক্রিয়াটা কিছুতেই মনে পড়ছে না। আপনার চাকরি থাকবে? থাকবে না। তখন কপাল চাপড়াবেন, 'এত বছরের চাকরিটা কটা দিনের অবহেলায় খুইয়ে ফেললাম।' কিন্তু সেই আক্ষেপ তখন আর কোনো কাজে আসবে না।

এবার ভাবুন তো পৃথিবীতে আমাদের কী কাজ দিয়ে পাঠানো হয়েছে। আমাদের সৃষ্টিকর্তা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, 'আমি জিন এবং মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদাত করার জন্য।' (কুরআন, ৫১:৫৬)

পার্থিব জীবনের নানান ব্যস্ততা আর প্রলোভন আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। আমাদের হৃদয় প্রতিদিন একটু একটু করে দূষিত হতে হতে হারিকেনের কাঁচের মতো এর উপর কালি পড়ে যায়। রামাদান হলো এই ছানিপড়া হৃদয়কে সাবান দিয়ে ঘষামাজা করে অন্তর্চক্ষুকে উন্মীলিত করার উপযুক্ত করে তোলার সময়। ১১ মাসের রোগ, এক মাসে সারাতে সবটুকু মনোযোগ, পরিচর্যা, অধ্যাবসায় এবং অনেক অনেক প্রার্থনার প্রয়োজন। কারণ এই এক মাসে যদি রোগ সারানো না যায় তবে এই ব্যাধির ওপর আরও ১১ মাসের আস্তর পড়বে। একসময় এই হৃদয়কে ডাক্তার ক্লিনিকালি ডেড ঘোষণা করবেন। এই দেহটা তখনও চলে ফিরে বেড়াবে হয়তো—একটা মৃত অন্তর নিয়ে—যার আলোটা অনেক আগেই নিভে গিয়েছে! ভয়াবহ!

তবে কেন আমরা রামাদানে নিজেদের বিশুদ্ধতার পথে পরিচালিত না করে বিগত ১১ মাসে যা না করেছি তার চেয়েও গভীর দুনিয়াপ্রীতিতে নিমজ্জিত হচ্ছি? Ramadan is serious business, Man! আমাদের রবের কাছে কান্নাকাটি করে সারাবছরের ত্রুটি-